কেরালা কলিং

কেরালা কলিং

ডি. অমিতাভ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

Kerala Calling By **D. Amitabh**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : February 2021
Price : 400.00
US $ 20
ISBN 978 984 95102 6 0
ঘরে বসে **অনিন্দ্য প্রকাশ**-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

যাদের জন্য অসামান্য সুন্দরী কেরালা আজও আমায় ডাকে...
ফা. জোস মারিয়াদাস
ও
বন্ধু সুভাষ পদ্মনাভন।

১

বাকি স্বপ্ন দেখা যায় না। ঘুম ভেঙে গেলে বাকি স্বপ্ন আর দেখা হয় না। তবুও মাথা গুঁজে আবার ঘুমটায় ঢুকতে চেয়েছিল সুমেধ। আসলে ঘুমটায় নয় স্বপ্নটায় ফিরতে চেয়েছিল সে। ঘুমোলে যদি স্বপ্নটা আবার জোড়া লাগানো যায়। ঘুমই আর এলো না, স্বপ্ন আর দেখবে কী! অগত্যা স্বপ্নটাকে কল্পনা দিয়ে জুড়তে চেষ্টা করে।

স্বপ্নে সুমেধ ফিরে গেছে নিজের গ্রামে। বড়ো মাঠটার মধ্যে একটা সুতি খাল। ফুট দশেক চওড়া হবে। তবে গভীর খুব, চওড়া পাড়। পাড়ে সারি সারি গাছ। গাঁ গঞ্জে যেমন গাছ হয়। তাল, শিরিষ, বাবলা। বুনোগাছও নানান। করমচা, সাঁইবাবলা, বুনোবাদাম। বেশির ভাগই কাঁঠল বৃক্ষ। বৃক্ষ বড়ো হলে খাল লাগোয়া জমির মালিক গাছ কেটে নেয় বাড়ির জানলা-দরজা বানাতে বা সারাতে। কখনও কখনও মেয়ের বিয়ে, মা-বাবার শ্রাদ্ধেও টাকার দরকারে গাছ কেটে বিক্রি করে দেয়। কাঠের আজকাল আকাশছোঁয়া দাম। কাটা গাছের গোড়া থেকে আবার গাছ বের হয়। বৃক্ষ হয়। আবার কেটে কাঠ হয়। ঋতুচক্রের মতোই এসব চলতে থাকে।

সুমেধ স্বপ্নে সেই গাছগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটছিল জুলির হাত ধরে। কী নরম হাত জুলির! সে অবশ্য জুলির হাত কখনও ধরেনি। জুলি সুন্দরী। বেশ বড়োলোক ওরা। বাবা সরকারি চাকরি করে। জুলি কোলকাতার কলেজে পড়ে। একটুর জন্য ডাক্তারিতে চান্স পায়নি বলে সায়েন্স ছেড়ে দিয়েছে অভিমান করে। জুলির মতো সুন্দরীর এরকম অভিমান মানায়। এখন লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে ইংরেজি নিয়ে পড়ে। তারপর নাকি জার্নালিজম পড়বে। এসব শোনা কথা। সুমেধ কখনও জুলির সঙ্গে কথা বলেনি। সে জুলির থেকে বছর পাঁচেকের বড়ো। তবু খুব ছোটোবেলা থেকে জুলির প্রতি সে অনুরক্ত। দূর থেকে ভালোবাসে সে জুলিকে। এক গ্রাম, পাশাপাশি পাড়া। এত কাছাকাছি কী

ভালোবাসা যায়! এক গ্রামের ছেলেমেয়ে মানে তো ভাইবোন। এভাবেই শেখানো হয়েছে ছোটোবেলা থেকে তাদের বাড়িতে।

তাছাড়া জুলিদের সামাজিক অবস্থান আর তাদের বাড়ির অবস্থা সমান নয়। সুমেধের বাবা জমিজায়গা চাষবাস করে। জমি আছে অনেকটা। চাষে চলে যায় সারা বছর। তাকে পড়িয়েছে সেই টাকায়। বোনের বিয়েও দিয়েছে। ওই পর্যন্তই। চাষ করে তার বেশি কিছু করা যায় না। মাটির বাড়ি এখনও তাদের। সে জায়গায় জুলিদের দোতলা বাড়ি। কিন্তু প্রেম তো আর নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না; বিশেষ করে একতরফা ভালোবাসা আরও সাংঘাতিক! রাজকুমারী বা চিত্রতারকার ঘরের সিঁধ কাটতে অসুবিধা হয় না তার।

সুমেধ জুলির হাত ধরে খালের পাড়ের ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছিল। যেন দুজনের কত ভালোবাসা। জুলির সম্মতির পর্যায় পিছনে ফেলে দুজনে এগিয়ে গেছে বহুদূর। প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ের দেখা করা। এরকম সময়েই স্বপ্নটা হারিয়ে যায়। সুমেধ আরেকবার স্বপ্নটা দেখতে চেষ্টা করে।

কিন্তু মশার জ্বালায় ঘুম আর আসে না। বাড়ি থেকে একটা সিঙ্গেল মশারি দিয়েছিল মা। প্রায় নতুন। মশা ঢোকার কথা নয়। তাহলে মশারির মধ্যে এত মশা এলো কোথা থেকে। আর ঘুম আসে না।

মশারি ভেদ করে রাগী একটা ছায়ামূর্তি হয়ে বেরিয়ে আসে সে। অন্ধকার হাতড়ে পুরানো গির্জার সুইচবোর্ডে হাত রাখে। অনেক সুইচ। কিন্তু আলো একটাই। পিয়ানোর রিডের মতো সুইচগুলো টিপতেই থাকে। অথচ ঈপ্সিত আলো জ্বলে না। মাঝরাতে পোড়ো এই গির্জার মধ্যে একা সুমেধ। কিছুটা ভয় জমে ওঠে তার মনে। সুমেধের ভয় কয়েকমুহূর্ত পরে কেটে যায়। আলো জ্বলে উঠেছে। ফিলামেন্টবাল্বের হলুদ আলোয় গির্জার পুরানো দেওয়াল আরও পুরানো লাগে। তা লাগুক। আলো মানে সাহস।

সুমেধ সুইচবোর্ড থেকে ফিরে আসে বিছানার কাছে। পুরানো গির্জার একমাত্র নতুন বস্তু তার ক্যাম্পখাট। নাইলনের ফিতের ক্যাম্পখাট। আলোয় সে আবিষ্কার করে মায়ের দেওয়া মশারির কোনও দোষ নেই। ক্যাম্পখাটের নাইলনের ফিতের মধ্য দিয়ে ঢুকে এসেছে মশকবাহিনী। ক্যাম্পখাটের উপর বিছানা বলতে একটা

বেডশিট অনেক আগেই সরে গেছে নাইলনের ফিতের মসৃণতা নিতে না পেরে। মশারিটা খুলে ফেলে সে। এ অবস্থায় মশারি রাখাও যা না-রাখাও তাই।

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরায় সুমেধ। পা ঝুলিয়ে বসতে তার ভালো লাগে। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো পাদুটো আস্তে আস্তে দুললে তার আরাম লাগে। কিন্তু ক্যাম্পখাটটা বেশ নিচু। পা মেঝেতে ঠেকে যায়। তার থেকেও বিরক্তিকর, মশা কামড়াচ্ছে সমানে। লুঙ্গিটা পায়ের উপর পড়ে আছে। কেরালাস্টাইলের কাটা লুঙ্গি। সুমেধের লুঙ্গির ফাঁক দিয়ে অনেকটা উঠে যাচ্ছে মশারা। ভাগ্য ভালো জাঙ্গিয়া পরে আছে, না হলে! ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে এই রে দুপুরে স্নানের সময় কেচে দেওয়া লুঙ্গি, গামছা, জাঙ্গিয়া গির্জার পিছন দিকে পড়ে আছে।

এপ্রিল মাস। গরমকাল। কেরালায় সারাবছরই গরম। শীতকালেও ফ্যান চালাতে হয়। রাত কত হয়েছে কে জানে। নটায় শুয়ে পড়েছিল। মোবাইলটা মাথার বালিশের পাশে থেকে টেনে আনতে গিয়ে হাতে লেগে যায় ব্যাগের হ্যান্ডেল। একটা থলে ব্যাগের ভিতর জামাকাপড় ঢুকিয়ে মাথার বালিশ করে চালাচ্ছে সে মনে পড়ে যায়! একটু মনে মনে হেসে নেয়। কী জীবন থেকে কী জীবনে এসে পড়েছে সে।

বাড়ির কথা ভাবতে গিয়েও মন থেকে সরিয়ে রাখে, বাড়ির প্রতি টান থাকলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে কেরালায় এসেছে তা সম্পূর্ণ হবে না ভেবে। সে ভাবনাটা সরাতে বর্তমানের প্রতি নজর দেয়। দুপুরের লুঙ্গি, গামছা তুলে আনতে পা বাড়ায়। গির্জার পিছন দিকটা অন্ধকার। নতুন গির্জা তৈরি হচ্ছে পুরানো গির্জার পাশেই। তার বনেদ খোঁড়া হয়েছে। বড়ো বড়ো গর্ত। কুয়োর মতো গভীর। নিজের পুরানো ব্যাটারিচালিত টর্চটা হাতে নেয় সে। দুর্বল আলো বের হচ্ছে। তবু সে ভরসামতো টর্চটা তালুতে আঁকড়ে নেয়।

গির্জার পিছনে লম্বা রবার বাগান। সার সার দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা ঢালু হয়ে উঠে গেছে অনেকটা। একদম শেষে একটা ঝোরামতো। বেশ গতিতে জল নেমে যায় রবার বাগানটাকে বাম হাতে রেখে। এদিকটা এলে একটা শব্দ কানে আসে। ঝোরার শোঁ-

শোঁ শব্দ। আজ এই মুহূর্তে শব্দের সঙ্গে একটা গন্ধও আসছে। বুনোগন্ধের সঙ্গে অন্যরকম একটা গন্ধ। নাকে লাগে জ্যাকার‍্যান্ডা ফুলের হালকা হয়ে আসা গন্ধটা। জ্যাকার‍্যান্ডা ফুলকে কী বলে যেন ইংরেজিতে। সুমেধ মনে করতে পারে না সেই মুহূর্তে। লুঙ্গি, গেঞ্জিটা হাতে নিয়ে ফেরার সময় মনে পড়ে ইংরেজিটা। লাইল্যাক। লাইল্যাক ফ্লাওয়ার। লাইল্যাক ফ্লাওয়ার এসেন্স! প্রেতাত্মারা খুব পছন্দ করে। অথবা প্রেতাত্মাদের গায়ে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়।

সুমেধ মুহূর্তে ভয় পায়। হুড়মুড় করে ভাঙা গির্জার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে মনে পড়ে গির্জার অনেকগুলো জানালা আস্ত নেই।

২

আজ পয়লা বৈশাখ। সুজাতার অনেক কাজ। ঘরে মেয়েজামাই এসেছে। কর্তা সকাল থেকে জাল ঠেঙিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরে এনেছে। অনিমেষের শরীর আজকাল আর আগের মতো নেই। সুজাতা অনিমেষকে বলেছিল বাজার থেকে মাছ কিনে আনতে। অনিমেষ তাতে রাজি হয়নি। বাজারের মাছ নাকি শহরের লোকে খায়। স্বাদ ভালো হয় না। আসলে সুজাতা জানে আলুথালু গরমে মানুষটা পুকুরে মাছ ধরার নাম করে জল ঘেঁটে শরীর ঠান্ডা করতে চায়। কেনা মাছ হলে পরিমাণমতো কেনা যায়। পুকুরের নিজস্ব মাছ হলে মাছ ধরার শেষ থাকে না। পোনামাছ বেশি হলে সুজাতার তত অসুবিধা হয় না। অভ্যস্ড় হাতে কেটেই ফেলে। একটু সময় লাগে এই যা। কিন্তু সব থেকে বিরক্ত লাগে চুনোমাছে! পুঁটি, চাঁদা, মৌরলা। বিরক্তি ঘাম হয়ে বের হয়। ঘরের পুকুরে মাছ ধরলে চুনোমাছ কেউ কখনও পুকুরে ফেলে দেয় না। অনিমেষ তো নয়ই। শেষপাতে চুনোমাছের টক তার বড়ো প্রিয়।

অবশ্য আজ মৌরলা মাছের দরকারও আছে। আজ গরর শিঙে আর খুরে তেল হলুদ মাখিয়ে মুখে মৌরলা মাছ খাইয়ে স্নান করাতে হয়। গরতে মাছ খায়! খায় না বলেই কলাপাতার মধ্যে মুড়ে মৌরলা মাছ গরর মুখে দিয়ে মুখ চেপে ধরতে হয় যাতে মুখ থেকে ফেলে না দেয়। বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। গত কয়েকবছর সুমেধ কাজটা করে। মাছ খাইয়ে একটা একটা গরকে পুকুরে নামিয়ে পাশে পাশে সাঁতার কাটতে কাটতে এক ফাঁকে হঠাৎ করে নিজের শরীর জল থেকে তুলে শরীরের ভর হাতের উপর এনে গরর শিঙের উপর চাপ দিলে তবেই গরর মাথা ডুববে। অনিমেষের বয়েস হচ্ছে। বাছুর বাদ দিয়ে

ছটা গর। চারটে গাইগর। আর একজোড়া হালের বলদ। বলদ দুটোকে নিয়েই ভয়। তাদের সঙ্গে ষাট ছুঁইছুঁই অনিমেষ পারবে তো! সুজাতা মনে মনে ভয় পায়।

এই সময় সুমেধ বাড়ি থাকলে খুব ভালো হতো। সুজাতার ছেলের উপর রাগ হয়। জমিজায়গা আছে দেখাশোনা কর, জীবন কেটে যাবে। কেরালায় গেছে বড়োলোক হতে! বাবা বুড়ো হচ্ছে কোথায় সাহায্য করবি তা নয় চলে গেলি নিজের খেয়ালখুশিমতো। ছেলেটা অবশ্য বরাবরই নিজের খেয়ালে চলে। অনিমেষ পড়াতে চায়নি বেশি। চাষির ছেলে চাষ করে খাবে বেশি পড়ে কী হবে। কিন্তু ছেলে জেদ করে কলেজ পাশ দিয়েছে। মাথা নাকি ভালো। তবু খুব ভালো রেজাল্ট করল না বি. এ. তে। খেলাধুলায় মাতল। লম্বাচওড়া চেহারা বলে কোথাকার কে একটা খ্রিষ্টান পাদরি নাকি ঝুড়িতে বল ফেলা খেলায় নিয়েছিল। কলেজ করতে কোলকাতায় থাকত। সেখানেই আলাপ-পরিচয় বন্ধুত্ব। হিন্দুর ছেলের সঙ্গে খ্রিষ্টান পাদরির আবার বন্ধুত্ব কী! সুজাতা এসব কথা বললে ছেলে শুধু হাসে।

সুমেধের হাসির কথা মনে পড়তেই সুজাতার সব রাগ উবে যায়। ছেলেটা বড্ড মিষ্টি হাসে। ছোটোবেলায় গালে টোল পড়ত। এখন আর পড়ে না বটে তবে সুমেধ হাসলে সুজাতা ছেলের মুখের অদৃশ্য সেই টোলটা ঠিক খুঁজে নেয়।

সুজাতার রাগটা গলে যায়। অভিমান হয়ে কয়েকফোঁটা জল নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে। দূরে থাকা ছেলের জন্য মায়ের চোখের জল নাকি অশুভ। সুজাতা কান্নাটা চেপে চোখের জল মুছে নেয়। তবু বুকের নদীতে জল উপচাতে থাকে তার।

—মা কাঁদছ কেন।

—কই! না তো।

—ঠিক আছে, দাও আমি সবজি কেটে দিচ্ছি।

সঞ্চিতা জানে মা কাঁদছে। কেন কাঁদছে তাও জানে। দাদা সুমেধ বাড়ি নেই। এখানে চাকরিবাকরি নেই। যদিও দাদার চাকরির ইচ্ছা বরাবরই কম। ইচ্ছা ব্যাবসা করার। ব্যাবসা করে বড়োলোক হবে। কেরালা গেছে বাস্কেটবল কোচের কথায়। সেখানে নাকি নানান ব্যাবসার সুযোগ আছে। কী ব্যাবসা করছে কে জানে। টাকা তো

পাঠায় না উলটে মায়ের বেশ কিছু টাকা নিয়ে গেছে। মা আর টাকা কোথায় পাবে। লুকিয়ে গয়না বন্ধক দিয়েছে। সঞ্চিতা অবশ্য সব জানে। দাদাই তাকে বলেছে। সে কাউকে বলেনি। দাদা গয়না বন্ধকের টাকা ফেরত করতে পারছে না বলে বেশ লজ্জিত। ফোনে সেকথা প্রায়ই বলে বোনকে। সঞ্চিতার কাছে টাকা থাকলে গয়নাগুলো ছাড়িয়ে দিত। কিন্তু তাদের অবস্থাও তথৈবচ। স্বামীর ইমিটেশনের গয়নার দোকান। আগে ভালো চলত, এখন খুব ভালো চলে না। এসব দোকান নাকি খুব বেশিদিন ভালো চলে না। বড়োজোর পাঁচ-সাত বছর। সঞ্চিতার ইচ্ছা আছে দাদা দাঁড়িয়ে গেলে বরকেও সেখানে পাঠিয়ে দেবে।

—আচ্ছা তুই সবজি কাট। আমি মাছ কুটতে যাই। তোর বাপের কম্ম দেখেছিস, রাজ্যের মাছ ধরে এনেছে। কে খাবে এত মাছ!

সুজাতা রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বের হয়। সবজির কষ লেগে ছিল হাতে। আবার মাছ কেটে হাত নোংরা হবে কিন্তু মাঝের এই সামান্য সময়টুকুও হাতে নোংরা রাখতে চায় না। সে পিট্‌পিটে শুচিবাইগ্রস্ত নয়; আসলে অভ্যাস।

রান্নাঘর আর বাড়ির মাঝে অনেকটা বড়ো উঠোন। সকাল দশটায়ই রোদের আংরা ঝরছে। উঠোনে লোহার বালতিতে মাছ রেখে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে গেছে। বালতিতে বড়ো মাছটা তখনও লাফাচ্ছে। সেই বালতির উপরদিকে আছে। শেষে ধরা পড়েছে। বালতির অর্ধেকের বেশি ভরা মাছ। কাতলামাছের তড়পানিতে বালতিটা কাত হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। টাল খেয়ে আবার সোজাও হয়ে যাচ্ছে। বালতির হ্যান্ডেলের সঙ্গে বালতির সংঘর্ষে ধাতব শব্দ উঠছে বারবার। যদিও মাছটার পালাবার উপায় নেই। বালতির মুখে ম্যালেরিয়াগাছের লতানে ঝোপ দিয়ে চাপা দেওয়া আছে।

—কই গো কোথায় গেলে! মাছগুলো অমন রোদে রেখে গেলে!

রোদ কড়া ঠিকই। তাই বলে মাছের কিছু হবার মতো নয়। আসলে সুজাতা বেশিক্ষণ অনিমেষকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এমনই তাদের বোঝাপড়া। সে স্বামীর সঙ্গে মাঠের কাজেও হাত লাগায়। অন্ড়ত একটা সময় লাগাত। এখন আর শরীরে কুলায় না। অনিমেষ কোদাল কোপালে সে ঘাস বেছেছে। ধান রইতে গেলে বা কাটতে

গেলে দুপুরের মুড়ি জল নিয়ে গেছে। সেও চাষির বাড়ির মেয়ে। পাকা সোনার মতো রং ছিল বিয়ের সময়। এখনও নতুন তামার মতো উজ্জ্বল সে।

দামাল রোদ এড়িয়ে ভিজে কাপড়ে বাতাবিলেবুগাছের নিচে সবে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল। মাছ ধরতে জাল ঠ্যাঙাতে হয়েছে খুব। ঘরে মেয়েজামাই অথচ বড়োমাছ না পড়লে চাষির দাম কিবা! খ্যাপলা জাল খিয়োতে বুকের অনেকটা দম বেরিয়ে যায় জালের সঙ্গে। অনিমেষ দম নিতে বিড়িতে কষে টান মারে। তখনই সুজাতার ডাক। এ ডাক উপেক্ষা করা যায় না। যতটা-না কাজের জন্য তার থেকে আদরের। সান্নিধ্যের আদর। এ গ্রামের লোকজন জানে অনিমেষ সুজাতা পরিশ্রমের কষ্ট উপেক্ষা করে ভালোবেসে।

—বলো!

অনিমেষ প্রাচীরের বাইরে থেকে ভেতরে আসতে আসতে বলে। ততক্ষণে সুজাতা মাছগুলো নিয়ে আমগাছতলার ছায়ায় বসেছে। অনিমেষও ছায়া খুঁজে বসে।

—হ্যাঁগো, পুকুরে আর বড়ো মাছ আছে?

অনিমেষ কী উত্তর দেবে! পুকুর কি সিন্দুক যে গুনে গুনে মাছ রাখা যায়। কত মাছ আছে পুকুর না ছেঁচলে বোঝা অসম্ভব। তবু আশার কথা শোনায় বউকে, আছে নিশ্চয়ই।

—দু-চারটে রেখে দিয়ো।

—কেন?

—খোকা এলে ধরো।

কথাটা বলেই সুজাতার মনে হয় কথাটা মেয়েজামাইয়ের কানে গেলে খারাপ ভাবতে পারে। মা হয়তো তাদের জন্য বড়ো মাছ ধরা পছন্দ করছে না। সে এবার বেশ জোরেই বলে, না না অনেক মাছ আছে। পয়লা বৈশাখ বড়ো মাছ খাওয়ার নিয়ম। খুকি মাছের মুড়ো খেতে ভালোবাসে।

অনিমেষ এসব সংসারী কূটকচালে বোঝে। মনে মনে হাসে। সে বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে বলে, বেরিয়ে যাচ্ছে।

সুজাতা দ্রত অথচ ছোট্ট থুতনি নাড়িয়ে জানতে চায়, কোথায়?

অনিমেষ এবার উচ্চারণ করেই বলে, গর চান করাতে! তার

কথায় যেন আত্মবিশ্বাসের অভাব।

অনিমেষ লুঙ্গি ভাঁজ করে নেয়। কোমরে গামছাটা সেঁটে বাঁধে। কোমরের গামছা জোর দিয়ে বাঁধলে পুরুষের শক্তি বাড়ে। বাছুরদুটোকেই প্রথম স্নান করাবে ভাবে।

—সঞ্চিতা! স ঞ্চি তা আ?

—হ্যাঁ বাবা?

—তোর মায়ের থেকে কটা মৌরলা মাছ নিয়ে আয় তো!

—আসছি বাবা।

—আর তেল হলুদ আনবি। আমি কলাপাতা ছিঁড়ে আনি।

—হ্যাঁ বাবা আসছি।

৩

কাল রাতে আর ঘুম হয়নি সুমেধের। বাকি রাতটা বেশ ভয়ে ভয়ে কেটেছে। প্রেতাত্মার ভয় নিয়ে জেগে ছিল পুরানো গির্জায়। একা মানুষের ভয় জাঁকিয়ে বসে। সুমেধের ভয়টা আতঙ্কের দিকে যাওয়ার মুহূর্তে মনে হয় সে তো গির্জার মধ্যে আছে। গির্জা তো খ্রিষ্টানদের মন্দির। মন্দিরে কখনও ভূত প্রবেশ করতে পারে না। তবু ঘুম আসে না। মনের নিশ্চয়তা না এলে ঘুম চোখে এসে বসে না।

ভাগ্য ভালো আজ কাজ হবে না। কাল রাতের ঘুমহীনতা তার শরীরে বেশ ছাপ ফেলেছে। আজ কাজ করতে হলে সে কাহিল হয়ে পড়ত। গরম যা পড়েছে তাতে কাজ করতে হলে শরীর মন সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে হবে। তবে এখানে গরম বেশি হলেও ঘাম হয় না বলে কাজ করতে অসুবিধা হয় না। তার কাজটাও হাড়ভাঙা খাটুনির। সে চাষির ছেলে। চাষের কাজে তার পটুত্ব আছে। চাষে একটাই কাজ কষ্টের। সেটা পৃথিবীর সঙ্গে লড়তে হয় বলে। মাটি কোপানো। বাকি গাছ বসানো বা ফসল কাটা তেমন কষ্টের নয়। যত্ন নেওয়ার মন থাকলে কষ্ট উপশম হয়ে যায়। কিন্তু এখানে সারাটা দিন কষ্টের রামধনু আঁকা হয়ে যায় তার শরীরে। তার থেকেও বেশি মনে।

সুমেধের গ্রাম শহর কোলকাতার বেশ কাছে। ঘণ্টাদেড়েক সময়ে সে গ্রাম থেকে একেবারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢুকে যেতে পারে। মাধ্যমিক পাশ করার পরে সে কোলকাতার কলেজে ভর্তি হয়। রেজাল্ট ভালো বলে আশুতোষ কলেজে সুযোগ পেয়ে যায়। তার থেকেও বেশি তার ইচ্ছা ছিল শহরটাকে জানার। কবে কোন বীজ বপন করার সময় উচ্চাশার এক বীজ তার মনের মাটিতে জায়গা পেয়েছিল সে জানে না। তবে রোজ একটু একটু জল দিয়েছে সে জানে।

শহরের সব মানব-সমৃদ্ধি গ্রামের থেকে নেওয়া। কিন্তু শহর সহজে গ্রামকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। সুমেধ শহরের হতে পারেনি। গ্র্যাজুয়েশনে তার রেজাল্ট ভালো হলো না। ইংরেজিতে অনার্স কেটে

যায়। পাশগ্র্যাজুয়েট হয়ে প্রফেসরদের কাছে নিজের মুখ পোড়াল। স্যারদের তার প্রতি অনেকটা আশা ছিল। কিন্তু সুমেধ তখন ব্রাউনিং, বে- ক, বার্নস, বায়রনের থেকে বেশি মজেছে বাস্কেটবলে।

কলেজ ফেরত সুমেধের সঙ্গে আলাপ হয় এক মাঝবয়েসি মানুষের। সুমেধ ফিরছিল হাজরা থেকে ট্রামে করে জোকা। জোকা থেকে সে বাস ধরে আমতলা ফিরবে। ট্রামের ফুটস্টেপে হাওয়া খেতে খেতে আসছিল লম্বাচওড়া সুমেধ। লোকটা কোথা থেকে উঠেছিল সুমেধ দেখেনি। ভিজে সপসপে টিশার্ট পরেছিল। শীতকালে ভিজে জামাকাপড় পরা লোক স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে যে-কেউ চমকে যাবে। কলেজে পড়া গ্রাম থেকে শহরে আসা সুমেধের আগ্রহ জন্মায়। লোকটাও দাঁড়িয়েছে তার পাশেই। ফুটবোর্ড ভাগ করে নিচ্ছে দুজনে।

—আচ্ছা একটা কথা বলব দাদা, আপনি কী করেন?

—হামি বাংলা জানে না! উইল ইউ স্পিক ইংলিশ?

সুমেধের ইংরেজিতে অসুবিধা নেই। ইংলিশ অনার্সের ছেলে সে। কিন্তু বলাটা, বলতে পারার আত্মবিশ্বাসটা সেদিনের আলাপ হওয়া লোকটাই দিয়েছিল।

পরে পরে সে জেনেছিল, গভীরভাবেই জেনেছিল মানুষটাকে। মানুষটা যাজক। খ্রিষ্টান ফাদার। নেশায় শুধু নয় কেরালার হয়ে ন্যাশনাল খেলা বাস্কেটবল পে□য়ার।

সেই ফাদারের আগ্রহেই গ্রামের খাঁটি মাটির মাঝে গড়ে ওঠা পাথরকোঁদা শরীরের সুমেধ বাস্কেটবল খেলতে শেখে। শেখে শুধু নয়, সব ভুলে বাস্কেটবল খেলাটাতে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে নেয়। তিন বছর সব ভুলে মন দিয়ে খেলেছে বাস্কেটবল আর মানুষটাকে চিনেছে, বন্ধু ভেবেছে। শিখেছে অনেককিছু। গাছের কোটর থেকে সুমেধকে ফাদার জোস ওন্নামকুট্টি তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বৃক্ষের শীর্ষের দিকে। কিন্তু হঠাৎ গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। সুমেধের ডান পায়ের গোড়ালির লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। অপারেশন করলে হয়তো সারত। হয়তো সারত না। কিন্তু কাটাছেঁড়ার অনুমতি পায়নি বাড়ির থেকে। কিচ্ছু হয়নি, শুধু খেলতে পারছে না বলে টাকা খরচের কোনো মানেই হয় না এমনটাই ভেবেছিল তার বাবা অনিমেষ।

—বাবা, আমার গোড়ালির অপারেশন করাতে হবে।

—কেন কী হয়েছে?

—কিছু হয়নি। অসুবিধা হচ্ছে।

—কোন পায়ে?

—ডান পায়ে।

—হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে?

—না।

—যন্ত্রণা হচ্ছে?

—না।

—মাঠের কাজে অসুবিধা হচ্ছে?

—না, খেলতে অসুবিধা হচ্ছে। জাম্প মারতে গেলে লাগছে!

—কী করতে গেলে?

—লাফাতে গেলে লাগছে।

—তাহলে লাফা-ঝাঁপা না করলেই হবে।

—অপারেশন না করালে খেলতে পারব না আর।

—ওসব শহরের খেলা তোর খেলে লাভ নেই। আমরা গ্রামের লোক! কাবাডি, ফুটবল, ক্রিকেট পর্যন্ড় ঠিক আছে। যে খেলা এখানে খেলা যাবে না সে খেলা খেলে কী হবে!

—বাবা!

—হাঁটতে-চলতে অসুবিধা নেই, যন্ত্রণা নেই; শুধু খেলার জন্য অপরেশন করার দরকার কী! তাছাড়া কাটাকুটি করতে টাকাও তো লাগবে?

—হ্যাঁ তা তো লাগবে।

—দরকার নেই তবে।

বাস্কেটবল আর খেলতে পারেনি সুমেধ। আন্ডার নাইনটিন খেলার বয়েস টপকে বাস্কেটবল খেলা শিখেছিল। সিনিয়ার স্টেট রিপ্রেজেন্ট করার আগেই খেলা ছেড়ে দিতে হয়। তবু সে রেড রোডের পাশে রাজ্য বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে সময় পেলেই খেলা দেখতে যেত। উচ্চাশার স্বপ্ন ছেড়ে এলেও স্বপ্নগুলো মাঝে মাঝে বড্ড জ্বালায়। বাস্কেটকোর্টের ধারে গেলেই সুমেধের চোখ এখনও ঝাপসা হয়ে আসে।

কেরালায় ফাদার জোস ওন্নামকুট্টিই এনেছে তাকে। খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলেও সুমেধের মনে উচ্চাশার স্বপ্ন ফাদারই উসকে রেখেছে। একজন ফাদারই পারে উচ্চাশার সঙ্গে সমাজসেবার কথা শেখাতে। গ্রামের গরিব মানুষদের উন্নতি চাই। বাবা-মাকেও ভালো

রাখতে হবে। ফাদার বলেছিল কেরালায় অনেক টাকা। যে-কোনও ব্যাবসা করতে পারলে অর্থের চিন্ড়া নেই। চ্যারিটি আর অ্যাম্বিশন দুই পূরণ হবে।

ফাদার জোস কোলকাতা থেকে কেরালায় ট্রান্সফার হয়ে আসার সময় নিয়ে এসেছে তাকে। এখন সে পেরাম্বাবুর শহরের একটা ভাঙা গির্জায় থাকে। ফাদার এখন কোথায় সুমেধ জানে না। ফাদার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না। যোগাযোগ করতে পারছে না সে। কিন্তু সে জানে ফাদার তার বন্ধু। বন্ধুত্বের মর্যাদা ফাদার ঠিক রাখবে। কারণ ফাদারই তাকে শিখিয়েছিল বন্ধুত্বের মহত্ত্ব।

সারা কেরালাজুড়ে আজ উৎসব। বিষু। সরকারি ছুটি। সুমেধদের কাজও বন্ধ। সুমেধ যে পুরানো গির্জায় থাকে সেটি পরিত্যক্ত। তার পাশেই বড়ো করে তৈরি হচ্ছে নতুন গির্জা। সুমেধ কাজ করছে গির্জার রাজমিস্ত্রিদের হেলপার হিসেবে। বাড়ি থেকে আনা টাকাপয়সা গত দুমাসে শেষ হয়ে গেছে। প্রথম দিকে হোটেল আর ব্যাবসার জন্য দৌড়ঝাঁপে টাকা খরচ করে ফেলেছে অনেক। টাকা ফুরিয়ে আসতে ফাদারকে বলতে ফাদার পেরেম্বাবুরের পুরানো গির্জায় তাকে রেখে যায়। ফাদার জোসই গির্জাটা বানিয়ে দিচ্ছে কন্ট্রাক্টর লাগিয়ে। সুমেধ সেই কন্ট্রাক্টরের আন্ডারেই কাজ করছে ডেলিওয়েজে। ভালো রোজ দেয়। তাদের গ্রামের রোজের আড়াইগুণ। সারাদিন তিনবার হোটেলে ভালো খাওয়ার পরেও হাতে অনেক টাকা জমে যায়। কিন্তু সেই টাকা জমিয়ে মায়ের গয়না ছাড়ানো যাবে না সে নিশ্চিত জানে।

কাজের ছুটি বলে কাল রাতের ঘুমহীনতার দুর্বলতা কাটিয়ে নিতে পারছে। কেরালার লোকেরা খাটতে পারে বটে। সকাল আটটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ড় এক মিনিট বসতে দেয় না। মাঠে খাটা হাট্টাকাট্টা সুমেধ, সদ্য প্রাক্তন পৃথিবীর দ্বিতীয় দ্রুততম খেলা বাস্কেটবলার সুমেধেরও গাল দিয়ে দম পড়ে। অথচ কোচ ফাদার শিখিয়েছিল কখনও ঠোঁট খুলে দম নেবে না।

—হোয়াই ফাদার?

—বিকজ হারা মানুষরা ওভাবে দম নেয়। একজন ভালো বাস্কেটবলার কখনও হারে না।

—বাস্কেটবলাররা কি সবাই সফল হয় ফাদার?

—জীবনে হারে না!

—কখনও হারে না?

—জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা সফল হয়!

—সত্যি ফাদার?

—গড প্রমিজ।

সারাদিন খাটার পরেও সুমেধ মনের মধ্যে ধরে রাখে সে গুড বাস্কেটবলার। সে হারবে না। যত কষ্টই হোক রাজমিস্ত্রিরির হেলপারের মতো ছোটো কাজে সে হারবে না। কিন্তু কাল মাঝরাত থেকে ঘুম না হওয়ায় আজ সকালে সে কাজ করতে পারত না। বিষুর জন্য বেঁচে গেছে আজ।

কাল রাতে সুমেধ যখন প্রেতাত্মার ভয় পাচ্ছিল তখন কেরালার লোকেরা ভোরবেলা উঠে কৃষ্ণের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা দিচ্ছিল। কাঁঠাল, আপেল, ঢ্যাঁড়শ, বরবটি, শসার ডালা সাজিয়ে দিচ্ছিল গোল ধাতবপাত্রে ধান চালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সামনে। এখানে কৃষ্ণের প্রিয় ফুল কানিকোন্না। ফুলটা সুমেধ দেখেছে। বাঁদরলাঠি ফুল যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ফুল হতে পারে কেরালায় না এলে সে জানতেই পারত না। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ওই ফুলটার নামকরণ করেছিলেন অমলতাস; সুমেধ ভাবে।

বিছানায় শুয়েছিল সে। গির্জার জাফরির ফাঁক গলে রোদ ঢুকছিল চুনোমাছের মতো। ছিপছিপে জলে তেচোকোমাছের মতো রোদটা খেলে বেড়াচ্ছিল তার বুকেমুখে। এবার উঠতেই হবে। বিষুর ছুটি এখানে আর তার বাড়িতে পয়লা বৈশাখ। সুমেধ মনে করতে পারে না। বাইশশো কিলোমিটার দূরে চলে গেলে বাড়ির কথা সব সময় মনে পড়ে না। বিশেষ করে মানুষ যখন সংগ্রাম করে, যদিও সব সংগ্রামই আসলে বাড়ির ভালোর জন্য, তখন বর্তমান ছাড়া তার কাছে কিছুই থাকে না। আজকের বাঁচায় কোনও কাল নেই। না আগামীকাল, না গতকাল!